সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

ঊনিশ শতকের গীতিনাট্যের ধারায় বাল্মীকিপ্রতিভা

নাঈমা ইসলাম*

সারসংক্ষেপ : দেশী ও বিলেতি সুরচর্চার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্মীকিপ্রতিভা রচনা করেছিলেন। বিলেতে যাওয়ার পূর্বে পারিবারিক ও নিজস্ব আগ্রহে নানান সুর দ্বারা যেমন তিনি অনুপ্রাণিত হন, তেমনি বিলেতে গিয়ে অপেরার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। বিলেতি সুরের ভাব প্রকাশের যে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা আছে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেশে ফিরে এসে তিনি রচনা করেন গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা'। প্রবন্ধটিতে উনবিংশ শতাব্দির প্রচলিত গীতিনাট্যধারা ও পাশ্চাত্যের প্রভাব কতটুকু রবীন্দ্রনাথকে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল তার একটি ধারণা অর্জন করতে প্রয়াস পাব।

গীতিনাট্য বলতে বোঝায় গীত ও নাটকের সমন্বয়ে রচিত নাটক। গানে যেমন সুর ও ছন্দ কথার প্রাণ, তেমনি গীতিনাট্যে কথা ও সুরের সাথে অভিনয়টাও মুখ্য। নাটকের বিষয়বস্তুকে অভিনয়ের সাথে সফলভাবে ফুটিয়ে তোলাটাই গীতিনাট্যের সার্থকতা। উনিশ শতকের পূর্বেও আমাদের দেশে গীতিনাট্যের প্রচলনের ইতিহাস পাওয়া যায়। গীতিনাট্য মূলত প্রথাগত অভিনয়ের সংগীতময় রূপায়ণ। আমাদের বাংলা গান, বাংলা সাহিত্য, প্রাচীনকাল থেকেই নাট্যধর্মিতাকে অঙ্গীকার করে একে অপরের পরিপূরকতায় পথ চলেছে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্যগীতিমূলক গীতিনাট্য রচনার ঐতিহ্য পাওয়া যায়। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* এবং *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* মধ্যে নৃত্যগীতিমূলক রচনার দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। গ্রামীণ সমাজে চন্ডীমণ্ডপ জাতীয় আসরেও কথকতার ঢঙে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি পরিবেশনের সময় অনেকক্ষেত্রে লাচাড়ি ছন্দে নাচের আঙ্গিক ব্যবহৃত হতো। আবার সেই সময় গীতিপ্রধান নাটকের ধারা বাংলার বাইরেও প্রচলিত ছিল। যেমন – অসমীয়া অংকিয়া নাট, নেপালের প্রাচীন সমপর্যায়ের নাটক এবং দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটে প্রচলিত বিশিষ্ট নৃত্যাভিনয়। গীতিনাটক সমসাময়িক কোনো বিষয়বস্তু অথবা পৌরাণিক কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হতো। ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ – এই কুড়ি বছর কলকাতাকে চিহ্নিত করা যায় শখের নাট্যশালার যুগ হিসাবে। এ সময়ে সাতটি নাট্যশালার কথা

---

*প্রভাষক (সংগীত), ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, আই. ই. আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.15

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি যথাক্রমে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যশালা, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটির নাট্যশালা এবং বাগবাজার শখের নাট্যশালা। পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং জোড়াসাঁকোর নাট্যশালার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জড়িত। তবে উল্লেখ্য যে – এই সব নাট্যশালার অধিকারী বা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন বনেদি ধনী পরিবার, কখনো এককভাবে আবার কখনো বা যৌথভাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) জন্মসূত্রে সাংগীতিক বলয়ের আবরণে বেড়ে উঠেছিলেন। পরিবারে সংগীতের চর্চা পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথের আমল থেকে শুরু করে পিতা দেবেন্দ্রনাথ, পরবর্তীকালে তাঁর ভ্রাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মধ্যেও চলমান ছিল। এর ফলে জন্মের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনের অজান্তেই নানান ধারার সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। বাড়িতে নানান উৎসবে ছোট ছোট নাটকে বাড়ির ছেলে-মেয়েরা অভিনয় করত তাতে কথার সাথে সুর বসিয়ে গানও থাকত। তারপর বিলেতে গিয়ে তিনি অপেরার সাথে পরিচিত হন। সেখানে সুরকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষের মনের আবেগের সুখ, দুঃখ, আনন্দ ব্যক্ত করার এক অপূর্ব নাটকীয়তা ছিল। এই সুরের নাটকীয়তা বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। বিলেত থেকে ফিরে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনা করেন; যার বেশ কিছু গান রবীন্দ্রনাথের বিলেত যাওয়ার পূর্বেই তাঁর দাদা রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্যে তা ব্যবহার করেন।

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্য ও গীতিবহুল নাট্যাভিনয়ের ধারা চলে এসেছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় অপেরার আদর্শ অনুযায়ী নতুন রূপ পেয়েছিল বাংলার গীতিনাট্যের ধারা। তাকে বলা হয়েছিল শখের যাত্রা, নতুন যাত্রা, গীতাভিনয়, অপেরা। এই নতুন গীতিনাট্যগুলোর অভিনয়ের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে মধ্যযুগের শাসনের অবসান ঘটিয়ে নতুন কলকাতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করেন। সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে নতুন স্বাদ বাঙালি পেয়েছিল তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকদের দান। এ সময় ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে একদিকে যেমন মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার ও ধর্মনৈতিক আদর্শের পরিবর্তন ঘটেছিল ক্রমে ক্রমে, তেমনি শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আধুনিকতার প্রবর্তন ঘটে। ক্লাব (Club) সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী অচিরেই কলকাতায় প্রচলন করলেন ক্লাব সংস্কৃতি, প্রেক্ষাগৃহ, Evening Party। সেই সময়ে সুদূর ইউরোপ থেকে নট-নটী এনে কলকাতায় ইংরেজদের স্থাপিত প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করা হতো থিয়েটার, অপেরা। যেখানে বাঙালিদের একেবারেই প্রবেশাধিকার ছিল না। এই শতকের শেষে (১৭৯৫) রুশ নাট্যকার হেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদেফের প্রযোজনায় প্রথম কলকাতায় মঞ্চস্থ হয় বাংলা নাটক। এই নাটকের সংগীত আয়োজন করেন লেবেদফ নিজেই এবং নাট্যরচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়।

উচ্চমূল্যের দর্শনী সত্ত্বেও প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ ছিল এই পরিবেশনায়। এই নাটক মঞ্চায়নে কলকাতায় বাঙালি সমাজে প্রথম পরিচয় ঘটে ইউরোপীয় নাট্যধারার সাথে। ক্রমেই বাঙালিদের মনে থিয়েটার, অপেরা ইত্যাদি নাট্যবিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মাতে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় কলকাতায় বেশ কটি নাট্যশালাও স্থাপিত হয়। এই নাট্যশালাগুলিকে কেন্দ্র করে কলকাতায় নাট্যাভিনয়ের এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হয়ে ওঠে কলকাতায় নাট্যাভিনয়ের প্রাণকেন্দ্র। এই রকম একটি পারিপার্শ্বিকতায় স্বভাবতই গীতিনাট্য অভিনয় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল এবং সহজেই আদৃত হয়েছিল। এর মূল কারণ ছিল ইউরোপীয় আদর্শে রঙ্গমঞ্চ গঠন করতে অনেক অর্থব্যয় করতে হতো। যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল না। এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। যাত্রাভিনয়ে অভিনেতা অভিনেত্রী আসরে উপস্থিত থেকে কথোপকথনমূলক সংলাপের সংযোজক গান গাইতেন। গীতিনাট্যের অভিনয়েও সেই রীতিই প্রচলিত ছিল। যাত্রা সংলাপে গানের ব্যবহার, অভিনয়ের সময় উপস্থিত গদ্য সংলাপ মধ্যযুগীয় কথকতার প্রভাবে পুষ্ট এবং ছড়া পাঁচালির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার পত্তনের পর থেকেই পাঁচালী ও কীর্তন ছিল শহুরে সংস্কৃতির অংশ। জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দই কীর্তন গানের প্রকৃত উৎস। এছাড়া বড়ু চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ প্রচুর কীর্তন গান রচনা করেছিলেন। এগুলোও ছিল আখ্যানধর্মী। আখরযুক্ত ও আখরবিহীন গানও ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢপকীর্তন কলকাতায় ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের শেষের দিকে বৈষ্ণব কীর্তন তার দিব্যভাব হারিয়ে বিভিন্ন লৌকিক রূপ ধারণ করতে শুরু করেছিল। ঢপগান সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় ঢপ গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও তার বহু আগে ঢপগান প্রচলিত ছিল। ঢপগানের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন মধুসূদন কিন্নর। এই মধুসূদন কিন্নর অর্থাৎ মধুকানের ঢপ ছিল মূলত ভক্তিমূলক। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ মধুকানের ঢপ গান শুনেছিলেন।[১] (দত্ত শৌনক, ৬ জানুয়ারি ২০১৮)

কীর্তন গানের সংলাপ বর্ণনার সাথে কীর্তনিয়া সুরে সুরে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এই গানকে ফুটিয়ে তোলেন। ঢপ কীর্তন সম্পর্কে বলার কারণ হলো, ইংরেজ শাসনের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাত্রার সংলাপে নায়ক-নায়িকারা চিরন্তন বেদনা ঢপের সুরে গান গেয়ে ব্যয় করতো। কৃষ্ণ, চৈতন্য ও দেব-দেবীর কাহিনিই ছিল গানের বিষয়বস্তু। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়, সময়ের পরিবর্তনের সাথে কৃষ্ণ, চৈতন্য, দেবদেবী পরিবর্তিত হয়ে মহাভারত, পুরাণ ও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি স্থান পেয়েছিল এবং নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্বে প্রাচীন রক্ষণশীলদের দ্বারা যাত্রার ধারা চলত বলে সে যুগের হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শৃঙ্গার রসাত্মক নগ্ন কামনার বহ্নিতাপ গায়ে এসে লেগেছিল। যাত্রার এই অবনতি দেখে ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত 'ভদ্রার্জুন' ও 'কীর্তিবিলাস' ইংরেজি নাটকের রীতিতে নাটক রচনা করে মোড় ফেরাতে

চেয়েছিলেন। ইংরেজি নাটক ও বাংলা অভিনয়ের ঐতিহ্য এক করে একটি মিশ্রবস্তু তৈরি হয়েছিল। ১৮৬৫ সালে নাটককে ভেঙে যাত্রা টেনে নামাবার পুনরায় চেষ্টা চলেছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' ভেঙে হরিমোহন রায় 'রত্নাবলী গীতাভিনয়' সৃষ্টি করেন। গীতাভিনয় যাত্রাও নয়, আবার নাটকও নয়, অথচ দুইয়েরই সংমিশ্রিত রূপ। গীতাভিনয় যাত্রারই নূতন সংস্করণ। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আগ পর্যন্ত নাটকের পুট দেওয়া গীতাভিনয়ই চলে আসছে। হরিমোহন রায় 'গীতিকা' নামে একটি বিশেষ শ্রেণির অভিনয় উদ্ভাবন করেন। 'জানকীবিলাপ'কে তিনি গীতিকা বলতে চেয়েছিলেন। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 'মানিনী' ও ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত 'পর্বতকুসুম'কেও তিনি গীতিকা নামে অভিহিত করেছেন।[২] (বার্ণিক রায়, জুলাই ১৯৮৯) গীতিকা বলতে হরিমোহন ইংরেজি অপেরা শব্দের বাংলা অর্থ করেছিলেন। সে সেময় গল্প বলার মাধ্যমে সমাজ ও জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করবার জনপ্রিয় সংগীত ছিল 'গীতিকা'।

ইংরেজিতে যাকে 'ballad' বলে বাংলায় তাকেই 'গীতিকা' বলে। তবে 'গীতিকা' ও 'ballad' সমার্থক নয়। 'গীতিকা' যেখানে একান্তভাবে গীত হবার জন্য রচিত সেখানে 'ব্যালাড' নিছক গানের জন্যই রচিত এমন কথায় পাশ্চাত্য দেশীয় সমালোচকেরা একমত পোষণ করেন না। অনেকেই বলে থাকেন 'ballad' এক ধরনের গীতিকা। বরুণ কুমার চক্রবর্তীর 'গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থে পাওয়া যায় – দীনেশ চন্দ্র সেন 'ballad'-কে গীতিকা নামে অভিহিত করেছেন। মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের। ময়মনসিংহ গীতিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'মহুয়া'। এই গীতিকাটির সাথে ইউরোপের মধ্যযুগীয় 'ট্রিস্টান ও ইসল্ড' (Tristan und Isolde) এবং 'অকাসিন ও নিকোলেটের' অতুলনীয় প্রেমকাহিনির গভীর সাদৃশ্য আছে। আবার অপর একটি জনপ্রিয় গীতিকা 'দেওয়ানামদিনা' পালাটির সাথে 'Butcher Boy' ও 'Fair Anni' গীতিকার কাহিনির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

অপেরা হলো অর্কেস্ট্রার সহযোগে দৃশ্য অভিনয়, আবৃত্তি ও সংগীতে সুসম্পূর্ণ নাটক। এখানে মানবজীবনের সূক্ষ্মতর অনুভূতিগুলো গানের সুরের আবেগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কারণ গানের সুরের যে প্রকাশধর্মিতা আছে তা গদ্য বা কবিতা দ্বারা প্রকাশ সম্ভব নয়। অপেরার মধ্যে সংগীতের সচেতনতা যেমন দেখা যায় তেমনিভাবে কল্পনার পরিধিও বিভিন্নভাবে বিস্তৃত হয়ে নাটকে রূপ পায়। অপেরা তার নিজস্ব সম্পূর্ণতা নিয়ে নিজেই এক শিল্পসৃষ্টি। নাটক ও সংগীত উভয়ের এই মিলনই অপেরা বা গীতিনাট্য। Ottavio Rinuchini লেখা ও Jacopo Peri সুর সংযোগে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দাফ্নে' নামক প্রথম অপেরার জন্ম নিল।[৩] (প্রাগুক্ত) ইতালীয় অপেরার মাধ্যমে কলকাতার জনগণের অপেরার সাথে পরিচয় ঘটেছিল। হরিমোহনের গীতিকা রচনায় মূলত ইতালীয় অপেরার অভিনয়ের সক্রিয় অনুপ্রেরণার খোরাক ছিল। অপেরার আদর্শে গীতিকা বা গীতিনাট্য রচনার প্রাথমিক পদপাত হরিমোহনের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়।

ডক্টর সুকুমার সেন *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* দ্বিতীয় খণ্ডে 'গ্র্যান্ড অপেরা' কে বাংলায় নাট্যরাসক বা গীতিনাট্যরূপে ব্যবহার করেছেন, অপেরা 'বুফ্' ও অপেরা 'কমিক' বোঝাতে নাট্যগীতি প্রয়োগ করেছেন। নাট্যরাসক বলতে সংস্কৃতে যে অর্থ ও দ্যোতনা ব্যবহৃত হয়, গীতিনাট্য বা গ্র্যান্ড অপেরায় সেই অর্থ বহন করে না। অপেরাকে গীতিনাট্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি কিন্তু *সাহিত্য দর্পণে* কথিত বহু তাল-লয়-স্থিত, হাস্য-শৃঙ্গার বিশিষ্ট মহৎ নায়ক ও বাসকসজ্জিকা সংবলিত লাস্যাঙ্গে একাঙ্ক নাটকের অভিনয় ব্যালে ও অপেরার মিশ্রকেই ব্যক্ত করে। রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য বলতে অপেরাকে বোঝাননি, তিনি বুঝিয়েছিলেন 'ম্যুজিকাল ড্রামা' কে। কারণ রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য সুরের সাথে নাটকের সংযোগ, এখানে কথার প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু অপেরাতে সুরটাই মুখ্য, নাটকীয়তা নয়। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে কথার ভাব ও সুরের মিশ্রণে নাটকে নাটকীয়তা ফুটে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গীতিনাট্য শব্দটির প্রয়োগ। ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত বিনোদবিহারী দত্তের রচিত গ্রন্থের নাম 'কনককাকন গীতিনাট্য'। বিনোদবিহারী দত্তের পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ 'গীতিনাট্য' শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন। ১৮৮০ সালে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাট্য, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' ও গীতিনাট্য। তবে ১৮৮১ সালে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' প্রকাশের পর থেকে গীতিনাট্য শব্দটি বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য রচনা করার সময়টি বাংলা শিল্পসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের কাল। তাঁর শিল্পীসত্তায় একদিকে ছিল বিহারীলালের কাব্যপ্রেরণা অন্যদিকে পাশ্চাত্য গীতিনাট্যের রূপরীতি। *বাল্মীকিপ্রতিভা* রচনাকালে *বাল্মীকি-প্রতিভার* ভাববস্তু বিহারীলালের *সারদামঙ্গলের* থেকেই নিয়েছিলেন। সে কথা রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করে গেছেন।[৪] (জীবনস্মৃতি, কার্তিক ১৪২৪)

রবীন্দ্রনাথ *সারদামঙ্গল* থেকে ভাবগ্রহণ করলেও রূপরীতি ও টেকনিক কারো কাছ থেকে গ্রহণ করেননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' ও স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্তউৎসব' গীতিনাট্যের প্রভাব বাল্মীকিপ্রতিভা রচনায় অদৃশ্য প্রভাব জুগিয়েছে। আবার এই দুই গীতিনাট্যে পাশ্চাত্য গীতিনাট্য বা অপেরার অনুসরণে ইতালীয় অপেরার প্রভাব সুস্পষ্ট। অমৃতলাল বসু তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় স্পষ্ট বলে গেছেন যে সেকালে কলকাতার সাহেবেরা চাঁদা তুলে উপর্যুপরি পাঁচ-ছয় বছর অভিনয়ের গ্যারান্টি দিয়ে লিন্ডসে অপেরা হাউসে ইতালীয় অপেরা সম্প্রদায়কে অভিনয় করাতেন। ১৮৬৮-৬৯-এর পর থেকে বিদেশি অপেরা ও নাট্যসম্প্রদায়ের কাছ থেকে শিক্ষিত বাঙালিরা বিদেশিদের অনুসরণে নাটক লিখে বিদেশি অতিবাস্তব দৃশ্যসজ্জা ও অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যকলার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ইতালীয় অপেরার আনন্দ উপভোগ করা বিশেষ দুঃসহ বা কষ্টসাধ্য ছিল না। ফলে 'মানময়ী' লেখায় এর থেকে তিনি অনুপ্রেরণা পান, পরে তা স্বর্ণকুমারী দেবীকেও অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করে।

বিলেতে ইংরেজি অপেরাকে নতুনরূপে সৃষ্টিতে হবাগ্‌নারের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শুরুর দিকে অপেরার বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয়। কালের বিবর্তনে বিচ্ছিন্ন কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তিমূলক গান, কোরাস প্রভৃতির একত্র সমাবেশ ও সুবিন্যাস আসে। গ্লুক ও মোৎজার্ট, অষ্টাদশ শতকের এই দুই মহারথী অপেরার নাটকীয় অবাস্তবতা এবং সুরের কৃত্রিমতা সংশোধন করেন। গ্লুকের দ্বারাই সর্বপ্রথম হবাগ্‌নারের গীতিনাট্যের দিক পরিবর্তন হয়। Wagner-এর অপেরা সুরে নাটক, নাট্যপ্রয়োজনে সুরের বিন্যাস। সমকালে হবাগ্‌নারের অপেরা পাশ্চাত্য সংগীত জগতে এক নতুন পথের সূচনা করেছিলেন; যাকে Wagner নাম দিয়েছিলেন 'Music Drama' বা গীতিনাট্য। ১৮৪৫ সালে 'Tannhavser' নাটকে Wagner প্রথম অপেরা থেকে গীতিনাট্য রচনা করেন।[৫] (বার্ণিক রায়, জুলাই ১৯৮৯) রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একবছর পাঁচ মাস বিলেতে ছিলেন। তার মধ্যে প্রথম ছয় মাস ব্রাইটনে এবং পরবর্তী এগারো মাস ছিলেন লন্ডনে। রবীন্দ্রনাথ তৎকালে লন্ডনে থাকার কারণে এই নবীন সৃষ্টির উৎসাহ ও তরঙ্গাঘাত তরুণ কবির মনে-প্রাণে লেগেছিল। হবাগ্‌নারের নাটকে দেখা যায়, আদ্যোপান্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে গীতিনাট্যের সামগ্রিক ভাব ও কাহিনির প্রকাশ। তবে হবাগ্‌নারের অর্কেস্টার জাদু নিহিত ছিল তাঁর গীতিনাট্যে।

বাল্মীকিপ্রতিভা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। বিদ্বজ্জনসমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে *বাল্মীকিপ্রতিভা* অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য রচনা করেছেন বলেই পাশ্চাত্য দেশের রীতি অনুযায়ী মিথ থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে হবে – এই রীতি অন্তত রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রেরণা ছিল না। উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এর আখ্যানবস্তু পৌরাণিক কাহিনি। এছাড়াও আমাদের যাত্রা পাঁচালি ইত্যাদি পূর্বতন নাট্যবিষয় গুলো প্রধানত ছিল পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর (যদিও আঠারো শতকের শেষ দিকে পাশ্চাত্য প্রভাবে সামাজিক বিষয়গুলো কখনো কখনো উঠে আসত)। রবীন্দ্রনাথের আত্মস্মৃতি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের নাটকাভিনয়ের প্রবল ইচ্ছাটি তাঁর বাড়িতে নানাবিধ অভিনয় এবং পাশ্চাত্যের নাট্যশিল্প দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় বলেছেন, "আমাদের বাড়িতে নাটকের প্রথম ইতিহাস হল – 'নবনাটকের' বেলা অন্যলোকে বই লিখলেন, আমাদের বাড়ির লোকে প্লে করলেন। 'অশ্রুমতি'র বেলা আমাদের বাড়ির লোকে বই লিখলেন বাইরের লোকে প্লে করলেন। তারপরে হল রবিকাকার আমলে আমাদের ঘরের লোক লিখলেন, আমরাই ঘরের ছেলেমেয়েরা অভিনয় করলুম। ১৮৬৭ সালে 'নবনাটকে'র অভিনয়ে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকলায় পাশ্চাত্যরীতিই অনুসৃত হয়েছে, 'অশ্রুমতি' নাটকের ভাবকল্পনায় শেক্সপিয়রীয় রোমান্টিক আদর্শই গৃহীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেমন নাট্যসৃষ্টির প্রতি আগ্রহ ছিল তার থেকেও অধিক আগ্রহ ছিল নাটকাভিনয়ে। অভিনয়কে লক্ষ্য রেখেই নাটকের ব্যক্তিভাবিত আইডিয়া এবং পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হতো, এই সঙ্গেই মিলত কবির ব্যক্তিত্ব এবং সেই ব্যক্তিত্বের মূলেই

ছিল পাশ্চাত্য বা ভারতীয় অদৃশ্য প্রেরণা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বর্ণকুমারী দেবী ব্যতীত ঠাকুর পরিবারে অন্য কারো নাটক লেখার ক্ষমতা বা প্রবণতা তেমন দেখা যায়নি। বাল্মীকীপ্রতিভা গীতিনাট্যের আখ্যানবস্তু কৃত্তিবাস বিরচিত বাংলা রামায়ণের সূচনাভোগ থেকে গৃহীত। এই কাহিনির মূল বাল্মীকি রামায়ণের সাথে পুরোপুরি মিল পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের কাহিনিটির সাথে মিল রেখে কিছু জায়গায় তাঁর স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্য রেখে নতুন একটি রূপদান করেন কাহিনিতে। একজন দস্যুপতি থেকে 'বাল্মীকি' হয়ে ওঠার ঘটনা বর্ণিত আছে নাটকে। দস্যুপতির মুখে দেবভাষা উচ্চারিত হয়ে বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন,

> "বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।"[৬] (রবীন্দ্রনাথ,জীবনস্মৃতি ১৪২৪ : ১১৮)

তিনি আরো বলেন,

> "আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল, বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।"[৭(প্রাগুক্ত)]

হার্বার্ট স্পেন্সারের 'The Origin and Function of Music' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন যে, "সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানেই আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত রাগ, দুঃখ, বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়ে প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটাই উৎকর্ষসাধন করে মানুষ সংগীত পেয়েছে।" স্পেন্সারের এই কথাটা রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তীকালে গীতিনাট্য রচনায় অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। বাল্মীকিপ্রতিভায় স্পেন্সারের প্রবন্ধের মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল, ফলে পরবর্তীকালে বাল্মীকিপ্রতিভার নানা ভাবের গানে তা প্রকাশ পায়। যেমনঃ ক্রোধের গান (এত বড় আস্পর্ধা তোদের), কান্নার গান (হায় কি দশা হলো আমার), উল্লাসের গান (তবে আয় সবে আয়), বিস্ময়ের গান (কি বলিনু আমি), হাসির গান (হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়) ইত্যাদি। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যটি ছয়টি দৃশ্যে বিভক্ত, যেখানে অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গতের সুর বসানো এবং গুটিকতকে গান ছিল বিলেতি সুরের। বিলাতি সুরের মধ্যে ডাকাতদের মত্ততার গানে ও আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে ব্যবহার করেছিলেন তিনি।

বাল্মীকিপ্রতিভার সুরগুলি অধিকাংশই দেশি সুর হলেও এতে ভারতীয় সংগীতের প্রভাব রয়েছে। কারণ চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের আখ্যায়িকামূলক রচনাবলিতে লক্ষ করলে দেখা যায় গানের অঙ্গ হিসাবে রাগ-রাগিনী ও তালের উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায় রবীন্দ্রপূর্ব গীতিনাট্যগুলোতে রাগ ও তালের উল্লেখ। যেমন :

সীতা। আগে এত ভাবিলে মনে
তবে কি দহিত দেহ বিরহদহনে ॥
রাম। আগে তা কি জানি মনে, হারাইবো তোমা ধনে,

পিলুয়া বারোঁয়া। ঠুংরী
(হরিমোহন রায়। জানকী বিলাপ)

বৃন্দে। কেন হে নাগর, রাই
বাঁশরিটি ধরে সুমধুর স্বরে
ডাকিতেছে শ্রীরাধায়।

ইমনকল্যাণ। আড়াঠেকা
ললিতা। ওহে শ্যাম এ তোমার ব্যাভার কেমন
রাধা বলে কেন ডাক যখন তখন

ঝিঁঝিট। কাওয়ালী
(হরিমোহন রায়। মানিনী) ইত্যাদি[৮] (প্রণয় কুমার কুণ্ডু, ২০১০)

রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা গীতিনাট্যগুলি বিভিন্ন নেতিবাচক উপাচারে পরিপূর্ণ থাকলেও যে একটি ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দাবি রাখে তা হলো গানগুলির সুরারোপে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব। বাংলা গীতিনাট্যের গানের এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কলকাতার সংগীতচর্চার সাথে সঙ্গতি রেখে বেশ কিছু রাগ-রাগিনী (ইমনকল্যাণ, ঝিঁঝিট, পিলু, খাম্বাজ, বারোঁয়া, বাহার, যোগিয়া, সিন্ধু, ভৈরব, ভৈরবী, কালাংড়া, টৌড়ি, আলাইয়া, ললিত, হাম্বীর, পরজবাহার, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি) ব্যবহৃত হতো এবং এই রাগ-রাগিনীর সাথে ত্রিতাল, চৌতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, ঠুংরী, আড়াঠেকা, যৎ, মধ্যমান ইত্যাদি তাল ব্যবহৃত হতো।

গীতিনাট্যটি রচনার সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় রাগ-রাগিনীগুলিকে নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। তিনি সংগীত শাস্ত্রের ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে গিয়ে রাগ-রাগিনীগুলিকে আপন খুশী মতো সুরের কাঠামোয় বাঁধতেন। ১৮৭৪ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সরোজিনী নাটকে দুটি গান ইংরেজি সুরে রচনা করেছিলেন এবং অশ্রুমতি নাটকের গানে তিনি ইটালিয়ান ঝিঁঝিটের সুর ব্যবহার করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত এইসব গতের সুরে কথা বসিয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভায় গান রচনা করেছেন। আমরা জানি ঠাকুরবাড়িতে আদিকাল থেকেই কালোয়াতী সংগীতের চর্চা প্রচলিত ছিল। যার ফলে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিলেতে যাওয়ার পূর্ব থেকেই ভারতীয় রাগ-রাগিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানসপটে

সমকালে কলকাতার নাট্যধারায় প্রচলিত ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব ও পারিবারিক সংগীত চর্চা উভয়ই মনে গেঁথে গিয়েছিল। *বাল্মীকিপ্রতিভা* রচনার সময় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব দেখা যায়, যেমন: রিমঝিম ঘনঘন রে (মল্লার, ত্রিতাল), হা, কী দশা হল আমার (বেহাগ-খাম্বাজ, ত্রিতাল), এই যে হেরি গো দেবী (বাহার, ত্রিতাল) ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যটি রচনার সময় রাগ-রাগিনীর এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। যার ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী এবং বসন্ত-উৎসবে, বিশেষ করে মানময়ীতে যতগুলি রাগ-রাগিনী ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই এই গীতিনাট্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় রাগরাগিনীকে আশ্রয় করে বিলেতি চলনের গান *বাল্মীকিপ্রতিভায়* রয়েছে। যেমন – এনেছি মোরা এনেছি মোরা (মিশ্র ঝিঁঝিট), এক ডোরে বাঁধিয়াছি মোরা সকলে (খাম্বাজ), আর না আর না এখানে আর না (নটনারায়ণ)। আবার কোনো কোনো গানে মিশ্র রাগও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: প্রথম দৃশ্যে জংলা ভূপালী (কালী কালী বলো রে আজ), দেশ-বেহাগ (এ কী এ ঘোর বন), দ্বিতীয় দৃশ্যে গারা-ভৈরবী (কী দশা হল আমার), সিন্ধু ভৈরবী (এ কেমন হল মন আমার) ইত্যাদি মিশ্র রাগ বিভিন্ন দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল নবজাগরণের প্রতীক। কারণ একদিকে ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঔপনষদিক ধর্ম ও জীবনাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অন্যদিকে ছিল নবাগত ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ। ফলে একই পরিবারের সংগীত চর্চায় দেশীয় ও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাশাপাশি য়ুরোপীয় সংগীতানুরাগের স্থান ছিল। আর ছিল পারিবারিক নাট্যমঞ্চে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের আয়োজন।

আবহমান বাংলা গানের নাট্যধর্মিতা যাত্রা, পাঁচালী কথকতার পর্যায় পেরিয়ে আঠারো শতকের শেষে (পলাশীর যুদ্ধের পর) কলকাতার ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে পাশ্চাত্য অপেরা প্রভাবিত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এই নাট্যবস্তু গীতিকা, গীতাভিনয় নাম পেরিয়ে গীতিনাট্য অভিধায় চিহ্নিত হয়। রবীন্দ্রনাথের *বাল্মীকিপ্রতিভা*, *কালমৃগয়া* মঞ্চায়নের মাধ্যমে এই গীতিনাট্য শব্দটি বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন পায়। সেইদিক থেকে বলা যায় আঠারো, উনিশ শতকের গীতিনাট্য ধারা রবীন্দ্রনাথের হাতেই চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

তথ্যসূত্র

১। দত্ত, শৌনক, কীর্তন, বাউল ও রবীন্দ্রনাথ, অন্যদেশ, দেবাশিস সেনগুপ্ত ১২, এস আই. এস এস এন ২৪৫৬-৫৫৩৯, ৬ জানুয়ারি ২০১৮

২। বার্ণিক রায়, হবাগ্‌নার ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, ৫ জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ২, ৩

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১০৯

৫। বার্ণিক রায়, হবাগ্‌নার ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, ৫ জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ২৬, ৩১

৬। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১১৮

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৮। প্রণয়কুমার কুন্ডু, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, ১লা জানুয়ারি ১৯৬৫, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ দীপাবলি ২০১০, পৃ. ৩৪, ৩৫

গ্রন্থপঞ্জি

অরুণ কুমার বসু (১৯৯৪)। *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

তপন রায় (২০১৬)। আপনি কী সুর উঠল বেজে, রবীন্দ্রনাথের আপন গান, প্রথম প্রকাশ, এস.পি প্রকাশনী, কলকাতা

দত্ত শৌনক (২০১৮)। *কীর্তন, বাউল ও রবীন্দ্রনাথ*, অন্যদেশ, কলকাতা

প্রণয়কুমার কুন্ডু (২০১০)। *রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

প্রশান্ত কুমার পাল (২০১৩)। *রবিজীবনী* (১ম ও ২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

বরুণ কুমার চক্রবর্তী (২০০৩)। *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা

বার্ণিক রায় (১৯৮৯)। *হবাগ্‌নার ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য*, পুস্তক বিপণি, ২৭ শাস্ত্ররুদ্র, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কোলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২৪)। *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা

সুধীর চক্রবর্তী (১৩৯২)। *গানের লীলার সেই কিনারে*, প্রথম প্রকাশ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা